আল ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস শুধু এ সূরাটির নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাটি নাযিল হবার কারণ হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয়* আমাদের জানান। একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়। (তাবারানী)।

(২) আবুল আলীয়াহ হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তিরমিযী, বুখারী ফিত তারীখ, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও বায়হাকী) এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস আবুল আলীয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বরাত নেই। ইমাম তিরমিযী একে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভুল বলেছেন।

---

* আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, اِنْسِبُهُ لَنَا (এর বংশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো বংশধারার। সে কোন্ বংশের লোক? কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করলো। তারা প্রশ্ন করলো, اِنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বংশধারা) আমাদের জানান।

(৩) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোন কোন হাদীস অনুযায়ী লোকেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশধারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ও আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া)।

(৪) ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাব প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, "হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যে রব আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের জানান।" এর জবাবে মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আদী, বায়হাকী ফিল আসমায়ে ওয়াস সিফাত)

এ ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া কয়েকটি হাদীস তাঁর সূরা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(৫) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, খয়বারের কয়েকজন ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, "হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূরের পরদা থেকে, আদমকে পচাগলা মাটির পিণ্ড থেকে, ইবলিসকে আগুনের শিখা থেকে, আসমানকে ধোঁয়া থেকে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা থেকে তৈরি করেছেন। এখন আপনার রব সম্বন্ধে আমাদের জানান (অর্থাৎ তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্ট?)" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার কোন জবাব দেননি। তারপর জিব্রীল (আ) আসেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "হুওয়াল্লাহু আহাদ" (তিনি আল্লাহ এক ও একক)............

(৬) আমের ইবনুত তোফায়েল রসূলুল্লাহকে (সা) বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের কোন জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন, "আল্লাহর দিকে।" আমের বলে ঃ "ভালো, তাহলে তার অবস্থা আমাকে জানান। তিনি সোনার তৈরি, না রূপার অথবা লোহার?" একথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

(৭) যাহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহুদীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে। তারা বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনার রবের অবস্থা আমাদের জানান। হয়তো আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে পারবো। আল্লাহ তাঁর গুণাবলী তাওরাতে নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরি? কোন গোত্রভুক্ত? সোনা, তামা, পিতল, লোহা, রূপা, কিসের তৈরি? তিনি পানাহার করেন কি না? তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে কার কাছ থেকে পৃথিবীর মালিকানা লাভ করেছেন? এবং তারপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

(৮) ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নাজরানের খৃষ্টানদের সাতজন পাদরী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলে ঃ "আমাদের বলুন, আপনার রব কেমন? তিনি কিসের তৈরি?"

তিনি বলেন, "আমার রব কোন জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব বস্তু থেকে আলাদা।" এ ব্যাপারে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

এ সমস্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) যে মাবুদের ইবাদাত ও বন্দেগী করার প্রতি লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেন তার মৌলিক সত্তা ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক প্রশ্ন করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন যখনই এসেছে তখনই তিনি জবাবে আল্লাহর হুকুমে লোকদেরকে এ সূরাটিই পড়ে শুনিয়েছেন। সর্বপ্রথম মক্কায় কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এরপর মদীনা তাইয়েবায় কখনো ইহুদী, কখনো খৃস্টান আবার কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরাও রসূলুল্লাহকে (সা) এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। প্রত্যেকবারই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হয় জবাবে এ সূরাটি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটিতে একথা বলা হয় যে, এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এর থেকে এ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী একথা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। আসলে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অবতীর্ণ কোন আয়াত বা সূরা থাকতো তাহলে পরে রসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখনই সেই একই বিষয় আবার উত্থাপিত হতো তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আসতো, এর জবাব উমুক আয়াত বা সূরায় রয়েছে অথবা এর জবাবে লোকদেরকে উমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দাও। হাদীসসমূহের রাবীগণ এ জিনিসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন উমুক সমস্যা দেখা দেয় বা উমুক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন এ আয়াত বা সূরাটি নাযিল হয়। একে বারংবার অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ একটি আয়াত বা সূরার বারবার নাযিল হওয়াও বলা হয়।

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটি আসলে মক্কী। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত করা যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের কোন বিস্তারিত আয়াত তখনো পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনো লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বার্তা শুনে জানতে চাইতো ঃ তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত–বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে। এর একেবারে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত হবার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, মক্কায় হযরত বেলালকে (রা) তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিতো তখন তিনি "আহাদ" "আহাদ" বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কিত যেসব হাদীস ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় চিন্তা–ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা কি ছিল তা জানা যায়। মূর্তি পূজারী মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের তৈরি খোদার কাল্পনিক মূর্তিসমূহের পূজা করতো। সেই মূর্তিগুলোর আকার, আকৃতি ও

দেহাবয়ব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতিমত বংশধারাও ছিল। কোন দেবী এমন ছিল না যার স্বামী ছিল না আবার কোন দেবতা এমন ছিল না যার স্ত্রী ছিল না। তাদের খাবার দাবারেরও প্রয়োজন দেখা দিতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এসবের ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের একটি বিরাট দল খোদার মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করায় বিশ্বাস করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ খোদার অবতার হয়ে থাকে। খৃষ্টানরা এক খোদায় বিশ্বাসী হবার দাবীদার হলেও তাদের খোদার কমপক্ষে একটি পুত্র তো ছিলই এবং পিতা পুত্রের সাথে খোদায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রুহুল কুদুসও (জিব্রীল) অংশীদার ছিলেন। এমন কি খোদার মা–ও ছিল এবং শাশুড়ীও। ইহুদিরাও এক খোদাকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের খোদাও বস্তুসত্তা ও মরদেহ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর উর্ধে ছিল না। তাদের এ খোদা টহল দিতো, মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোন বান্দার সাথে কুশ্‌তিও লড়তো। তার একটি পুত্রও (উযাইর) ছিল। এ ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া আরো ছিল মাজূসী—অগ্নি উপাসক ও সাবী—তারকা পূজারীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও লা–শরীক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয় তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সেই রবটি কেমন, সমস্ত রব ও মাবুদদেরকে বাদ দিয়ে যাকে একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? এটা কুরআনের অলৌকিক প্রকাশভংগীরই কৃতিত্ব। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআন মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধরনের মুশরিকী চিন্তা ও ধ্যান–ধারণার মূলোৎপাটন করে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও সংযুক্ত করার কোন অবকাশই রাখেনি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহত্বের অধিকারী। বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এ গুরুত্ব অনুভব করাতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বেশী করে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী করে ছড়িয়ে দেয় এ জন্য ছিল তাঁর এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকীদাকে (তাওহীদ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনার সাথে সাথেই মানুষের মনে গেঁথে যায় এবং তারা সহজেই মুখে মুখে সেগুলো আওড়াতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কুরআনের এক–তৃতীয়াংশের সমান—এ মর্মে হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বহু হাদীস আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুদদারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কা'ব, কুলসুম বিনতে উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, ইবনে উমর, ইবনে মাস'উদ, কাতাদাহ ইবনুন নু'মান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির বহু

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনটি বুনিয়াদী আকীদার ওপর। এক, তাওহীদ। দুই, রিসালাত। তিন, আখেরাত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ তত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুল্লাহ (সা) একে কুরআনের এক–তৃতীয়াংশের সমান গণ্য করেছেন।

হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অভিযানে এক সাহাবীকে সরদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে প্রত্যেক নামাযে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়ে কিরআত শেষ করতেন। এটা যেন তার স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুল্লাহর (সা) কাছে একথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন ঃ এতে রহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এর পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে লোকদের বলেন ঃ اخبروه ان الله تعالى يحبه "তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।"

প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী কুবার মসজিদে নামায পড়াতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাকাআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি উঠায়। তারা বলেন, তুমি এ কেমন কাজ করছো, প্রথমে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়ো তারপর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আবার তার সাথে আর একটি সূরা পড়ো? এটা ঠিক নয়। শুধুমাত্র "কুল হুওয়াল্লাহ" পড়ো অথবা একে বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়ো। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নামায পড়াবো অথবা ইমামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকেরা তাঁর জায়গায় আর কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতো না। অবশেষে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহর (সা) সামনে আসে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন্ জিনিসটি তোমাকে প্রত্যেক রাকআতে এ সূরাটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বলেন ঃ এ সূরাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ "এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ③
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④

বলো,[১] তিনি আল্লাহ,[২] একক।[৩] আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।[৪] তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।[৫] এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[৬]

১. এখানে 'বলো' শব্দের মাধ্যমে প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাঁকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাঁকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রসূলের (সা) তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহকে (সা) যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা তাকেই বলতে হবে।

২. অর্থাৎ আমার যে রবের সাথে তোমরা পরিচিত হতে চাও তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সামনে আমি কোন নতুন রব নিয়ে আসিনি। অন্যসব মাবুদদের ইবাদাত ত্যাগ করে কোন নতুন মাবুদের ইবাদাত করতে আমি তোমাদের বলিনি। বরং আল্লাহ নামে যে সত্তার সাথে তোমরা পরিচিত তিনি সেই সত্তা। আরবদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি কোন নতুন ও অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাচীনতম কাল থেকে বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার প্রতিশব্দ হিসেবে তারা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য দেবতার সাথে এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট করতো না। অন্য মাবুদদের জন্য তারা "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিল আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময়। সে সময় কা'বাঘরে ৩৬০টি উপাস্যের মূর্তি ছিল। কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুশরিকরা তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভালোভাবে জানতো, এ সংকটকালে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তাই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। কা'বাঘরকেও তারা এসব ইলাহের সাথে সম্পর্কিত করে বায়তুল আ–লিহাহ (ইলাহ–এর বহুবচন) বলতো না বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে একে বলতো বায়তুল্লাহ। আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের আকীদা কি ছিল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা

যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরে পয়দা করেছে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৮৭ আয়াত)

সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশসমূহ ও যমীনকে কে পয়দা করেছে এবং চাঁদ ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা বলবে আল্লাহ।......আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং কার সাহায্যে মৃত পতিত জমিকে সঞ্জীবতা দান করলেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৬১–৬৩ আয়াত)।

সূরা মু'মিনূনে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জানো, এ যমীন এবং এর সমস্ত জনবসতি কার? এরা অবশ্যি বলবে আল্লাহর।......এদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও মহাআরশের মালিক কে? এরা অবশ্যি বলবে, আল্লাহ।....... এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর কার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত? আর কে আশ্রয় দান করেন এবং কার মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারেন না? এরা নিশ্চয়ই বলবে, এ ব্যাপারটি তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (৮৪–৮৯ আয়াত)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের আকাশ ও যমীন থেকে রিযিক দেন? তোমরা যে শ্রবণ ও দৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েছো এগুলো কার ইখতিয়ারভুক্ত? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? এবং কে এ বিশ্বব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন? এরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।" (৩১ আয়াত)।

অনুরূপভাবে সূরা ইউনুসের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যখন তোমরা জাহাজে আরোহণ করে অনুকূল বাতাসে আনন্দ চিত্তে সফর করতে থাকো আর তারপর হঠাৎ প্রতিকূল বাতাসের বেগ বেড়ে যায়, চারদিক থেকে তরংগ আঘাত করতে থাকে এবং মুসাফিররা মনে করতে থাকে, তারা চারদিক থেকে ঝনঝা পরিবৃত হয়ে পড়েছে, তখন সবাই নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁরই কাছে দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ "হে আল্লাহ যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবো। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এই লোকেরাই সত্যচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।"

সূরা বনী ইসরাঈলে একথাটিরই পুনরাবৃত্তি এভাবে করা হয়েছে ঃ "যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (৬৭ আয়াত)।

এ আয়াতগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সেই রব কে এবং কেমন, যার ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য আপনি আমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন? তিনি এর জবাবে বললেন ঃ هُوَ اللّٰهُ তিনি আল্লাহ। এ জবাব থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়, যাকে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ও সারা বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, প্রভু, আহারদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলে মানো এবং কঠিন সংকটময় মুহূর্তে অন্য সব মাবুদদের পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য করার

আবেদন জানাও, তিনিই আমার রব এবং তাঁরই ইবাদাত করার দিকে আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। এ জবাবের মধ্যে আল্লাহর সমস্ত পূর্ণাংগ গুণাবলী আপনা আপনি এসে পড়ে। কারণ যিনি এ বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিকর্তা, যিনি এর বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন, যিনি এর মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীর আহার যোগান এবং বিপদের সময় নিজের বান্দাদের সাহায্য করেন তিনি জীবিত নন, শুনতে ও দেখতে পান না, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী নন, করুণাময় ও স্নেহশীল নন এবং সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নন, একথা আদতে কল্পনাই করা যায় না।

৩. ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে উলামায়ে কেরাম هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে যে বিশ্লেষণটি এখানকার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় সেটি হচ্ছে ঃ هُوَ উদ্দেশ্য (Subject) اَللّٰهُ তার বিধেয় (Predicate) এবং اَحَدٌ তার দ্বিতীয় বিধেয়। এ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক। অন্য অর্থ এও হতে পারে এবং ভাষারীতির দিক দিয়ে এটা ভুলও নয় যে, তিনি আল্লাহ এক।

এখানে সর্বপ্রথম একথাটি বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটিতে মহান আল্লাহর জন্য "আহাদ" শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় এ শব্দটির একটি অস্বাভাবিক ব্যবহার। সাধারণত অন্য একটি শব্দের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন ঃ يَوْمُ الْاَحَدِ "সপ্তাহের প্রথম দিন।" অনুরূপভাবে فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ "তোমাদের কোন একজনকে পাঠাও।" অথবা সাধারণ নেতিবাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন ঃ مَاجَاءَنِىْ اَحَدٌ "আমার কাছে কেউ আসেনি।" কিংবা ব্যাপকতার ধারণাসহ প্রশ্ন সূচক বাক্যে বলা হয়। যেমন ঃ هَلْ عِنْدَكَ اَحَدٌ "তোমার কাছে কি কেউ আছে?" অথবা এ ব্যাপকতার ধারণাসহ শর্ত প্রকাশক বাক্যে এর ব্যবহার হয় যেমন ঃ اِنْ جَاءَكَ اَحَدٌ "যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।" অথবা গণনায় বলা হয়। যেমন ঃ اَحَدٌ ، اِثْنَانِ ، اَحَدٌ عَشَرَ "এক, দুই, এগার।" এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছাড়া কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় اَحَدٌ (আহাদ) শব্দটির গুণবাচক অর্থে ব্যবহার অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের গুণ প্রকাশ অর্থে "আহাদ" শব্দের ব্যবহারের কোন নজির নেই। আর কুরআন নাযিলের পর এ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অস্বাভাবিক বর্ণনা পদ্ধতি স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ করে যে, একক ও অদ্বিতীয় হওয়া আল্লাহর বিশেষ গুণ। বিশ্ব–জাহানের কোন কিছুই এ গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুশরিক ও কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখুন, هُوَ اللّٰهُ বলার পর اَحَدٌ বলে কিভাবে তার জবাব দেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমত, এর মানে হচ্ছে, তিনি একাই রব। তাঁর 'রবুবিয়াতে' কারো কোন অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই 'উলুহীয়াতে'ও (মাবুদ হবার গুণাবলী) কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

দ্বিতীয়ত, এর মানে এও হয় যে, তিনি একাই এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ্ব–রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্ব–ব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিজগতের রিযিক তিনি একাই দান করেন। সংকটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করো, এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোন অংশও নেই।

তৃতীয়ত, তারা একথাও জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কিসের তৈরি? তাঁর বংশধারা কি? তিনি কোন প্রজাতির অন্তরভুক্ত? দুনিয়ার উত্তরাধিকার তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন? এবং তাঁর পর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিমাত্র "আহাদ" শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে ঃ (১) তিনি এক আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁর পরেও কেউ আল্লাহ হবে না। (২) আল্লাহর এমন কোন প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন। বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগোত্রীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। (৩) তাঁর সত্তা নিছক واحد এক নয় বরং احد একক, যেখানে কোন দিক দিয়ে একাধিক্যের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কোন সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করা যেতে পারে না। তার কোন আকার ও রূপ নেই। তা কোন স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কোন জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তাঁর কোন বর্ণ নেই। কোন অংগ–প্রত্যংগ নেই। কোন দিক নেই। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন–বিবর্তন ঘটে না। সকল প্রকার ধরন ও প্রকরণ মুক্ত ও বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সবদিক দিয়েই আহাদ বা একক। (এ পর্যায়ে একথাটি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, আরবী ভাষায় "ওয়াহেদ" শব্দটিকে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয় যেমনভাবে আমাদের ভাষায় আমরা "এক" শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিপুল সংখ্যা সম্বলিত কোন সমষ্টিকেও তার সামগ্রিক সত্তাকে সামনে রেখে "ওয়াহেদ" বা "এক" বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি, এক জাতি, এক দেশ, এক পৃথিবী, এমন কি এক বিশ্ব–জাহানও। আবার কোন সমষ্টির প্রত্যেক অংশকেও আলাদা আলাদাভাবেও "এক"–ই বলা হয়। কিন্তু "আহাদ" বা একক শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ জন্য কুরআন মজীদে যেখানেই আল্লাহর জন্য ওয়াহেদ (এক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে ঃ "ইলাহুন ওয়াহেদ" এক মাবুদ বা "আল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহ্‌হার"—এক আল্লাহই সবাইকে বিজিত ও পদানত করে রাখেন। কোথাও নিছক "ওয়াহেদ" বলা হয়নি। কারণ যেসব জিনিসের মধ্যে বিপুল ও বিশাল সমষ্টি রয়েছে তাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে আহাদ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহই একমাত্র সত্তা ও অস্তিত্ব যার মধ্যে কোন প্রকার একাধিক্য নেই। তাঁর একক সত্তা সবদিক দিয়েই পূর্ণাংগ।

৪. মূলে "সামাদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ص م د ধাতু থেকে। আরবী ভাষায় এ ধাতুটি থেকে যতগুলো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর ওপর নজর বুলালে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানা যায়। যেমন ঃ الصمد মনস্থ করা, ইচ্ছা করা। বিপুলায়তন বিশিষ্ট উন্নত স্থান এবং বিপুল ঘনত্ব বিশিষ্ট উন্নত মর্যাদা। উচ্চ

সমতল ছাদ। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও পিপসার্ত হয় না। প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরণাপন্ন হতে হয়।

اَلصَّمَدُ : প্রত্যেক জিনিসের উঁচু অংশ। যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই। যে নেতার আনুগত্য করা হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের ফায়সালা করা হয় না। অভাবীরা যে নেতার শরণাপন্ন হয়। চিরন্তন। উন্নত মর্যাদা। এমন নিবিড় ও নিচ্ছিদ্র যার মধ্যে কোন ছিদ্র, শূন্যতা ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোন জিনিস বের হতে পারে না এবং কোন জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধা–তৃষ্ণার শিকার হয় না।

اَلْمُصْمَدُ : জমাট জিনিস, যার পেট নেই।

اَلْمُصَمَّدُ : যে লক্ষের দিকে যেতে মনস্থ করা হয়; যে কঠিন জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

بَيْتٌ مُصْمَدٌ : এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়।

بِنَاءٌ مُصْمَدٌ : উঁচু ইমারত।

صَمَدَهُ وَصَمَدَ اِلَيْهِ صَمْدًا : ঐ লোকটির দিকে যাওয়ার সংকল্প করলো।

اَصْمَدَ اِلَيْهِ الْاَمْرَ : ব্যাপারটি তার হাতে সোপর্দ করলো; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আস্থা স্থাপন করলো। (সিহাহ, কামূস ও লিসানুল আরব)।

এসব শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে "আল্লাহুস সামাদ" আয়াতটিতে উল্লেখিত "সামাদ" শব্দের যে ব্যাখ্যা সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তীকালের আলেমগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি ঃ

হযরত আলী (রা), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন ঃ সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন ঃ তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এ প্রসংগে ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে ঃ লোকেরা কোন বিপদে–আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণাতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ যিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সামাদ।

ইকরামার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে ঃ যার মধ্য থেকে কোন জিনিস কোনদিন বের হয়নি এবং বের হয়ও না আর যে পানাহার করে না, সে–ই সামাদ। এরই সমার্থবোধক উক্তি সা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

সুদ্দী বলেছেন ঃ আকাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায়, তাকেই সামাদ বলে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন ঃ যে নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হয়।

রাবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ যার ওপর কখনো বিপদ–আপদ আসে না।

মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন ঃ যিনি সকল প্রকার দোষ–ত্রুটি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন ঃ অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এই একই ধরনের উক্তি করেছেন মুজাহিদ, মা'মার ও মুররাতুল হামদানী।

মুররাতুল হামদানীর আর একটি উক্ত হচ্ছে ঃ যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে; যার হুকুম ও ফায়সালা পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন ঃ যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমবারী বলেছেন ঃ সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার ওপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন্ন হয়, অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আয যুজাজের বক্তব্য প্রায় এর কাছাকাছি। তিনি বলেছেন ঃ যার ওপর এসে নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় সামাদ।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম বাক্যে "আল্লাহ আহাদ" কেন বলা হয়েছে এবং এ বাক্যে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে কেন? "আহাদ" শব্দটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি, তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট—আর কারো জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয় না। তাই এখানে "আহাদুন" শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে "সামাদ" শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই "আল্লাহু সামাদুন" না বলে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়। কারণ তা অবিনশ্বর নয়—একদিন তার বিনাশ হবে। তাকে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়। তা বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত। যে কোন সময় তার উপাদানগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি

জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন—নেন না। তিনি একক—যৌগিক ও মিশ্র নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্লেষণযোগ্য নন। সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি নিছক "সামাদ" নন, বরং "আসসামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি মূলত সামাদ তথা অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত।

আবার যেহেতু তিনি "আসসামাদ" তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভরশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আসসামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, "আসসামাদ" হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না।

৫. মুশরিকরা প্রতি যুগে খোদায়ীর এ ধারণা পোষণ করে এসেছে যে, মানুষের মতো খোদাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে–শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্ততিও ঠিক করে নিয়েছে। তাই কুরআন মজীদে আরববাসীদের আকীদা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তারা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। তাদের জাহেলী চিন্তা নবীগণের উম্মাতদেরকেও সংরক্ষিত রাখেনি। তাদের মধ্যেও নিজেদের সৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার আকীদা জন্ম নেয়। এ বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক চিন্তা–বিশ্বাসের মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা সবসময় মিশ্রিত হতে থেকেছে। কিছু লোক মনে করেছে, যাদেরকে তারা আল্লাহর সন্তান গণ্য করছে তারা সেই মহান পবিত্র সত্তার ঔরসজাত সন্তান। আবার কেউ কেউ দাবী করেছে, যাকে তারা আল্লাহর সন্তান বলছে, আল্লাহ তাকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছেন। যদিও তাদের কেউ কাউকে (মাআ'যাল্লাহ) আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন কোন সত্তা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের দায়িত্বমুক্ত নন এবং তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি মানুষ জাতীয় এক ধরনের অস্তিত্ব, তাঁর ঔরসে সন্তান জন্মলাভ করে এবং অপুত্রক হলে তার কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মন তাঁকেও কারো সন্তান মনে করার ধারণা মুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, আল্লাহর বংশধারা কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, কার কাছ থেকে তিনি দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন এবং তাঁর পরে এর উত্তরাধিকারী হবে কে?

এসব জাহেলী মূর্খতা প্রসূত ধারণা–কল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোকে যদি নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসকেও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন ঃ

এক ঃ আল্লাহ এক নয়, বরং আল্লাহর কোন একটি জাতি ও গোষ্ঠী আছে। তাদের সদস্যরা আল্লাহর গুণাবলী, কার্যকলাপ ও কর্তৃত্ব–ক্ষমতায় তাঁর সাথে শরীক। আল্লাহর কেবলমাত্র ঔরসজাত সন্তান ধারণা করে নিলে এ বিষয়টি অপরিহার্য হয় না, বরং কাউকে পালকপুত্র হিসেবে ধারণা করে নিলেও এটি অপরিহার্য হয়। কেননা কারো পালকপুত্র অবশ্যি তারই সমজাতীয় ও সমগোত্রীয়ই হতে পারে। আর (মা'আযাল্লাহ) যখন সে আল্লাহর সমজাতীয় ও সমগোত্রীয় হয়, তখনই সে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্নও হবে, একথা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

দুই ঃ পুরুষ ও নারীর মিলন ছাড়া কোন সন্তানের ধারণা ও কল্পনা করা যেতে পারে না। বাপ ও মায়ের শরীর থেকে কোন জিনিস বের হয়ে সন্তানের রূপ লাভ করে—সন্তান বলতে একথাই বুঝায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তান ধারণা করার ফলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর একটি বস্তুগত ও শারীরিক অস্তিত্ব, তাঁর সমজাতীয় কোন স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং তার শরীর থেকে কোন বস্তু বের হওয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিন ঃ সন্তান উৎপাদন ও বংশধারা চালাবার কথা যেখানে আসে সেখানে এর মূল কারণ হয় এই যে, ব্যক্তিরা হয় মরণশীল এবং তাদের জাতির ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের সন্তান উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এ সন্তানদের সাহায্যেই তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করলে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি নিজে যে মরণশীল এবং তাঁর বংশ ও তাঁর নিজের সত্তা কোনটিই চিরন্তন নয় একথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমস্ত মরণশীল ব্যক্তির মতো (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহরও কোন শুরু ও শেষ আছে, একথাও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের ওপর যেসব জাতি ও গোত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের ব্যক্তিবর্গ অনাদি–অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হয় না।

চার ঃ কারো পালকপুত্র বলবার উদ্দেশ্য এ হয় যে, একজন সন্তানহীন ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কারো সাহায্যের এবং নিজের মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন বোধ করে। কাজেই আল্লাহ কাউকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন একথা মনে করা হলে সেই পবিত্র সত্তার সাথে এমন সব দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো মরণশীল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও মহান আল্লাহকে "আহাদ" ও "আসসামাদ" বললে এসব উদ্ভট ধারণা–কল্পনার মূলে কুঠারঘাত করা হয়, তবুও এরপর "না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান"—একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয়–সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা–কল্পনা শিরকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তরভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ

বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে ঃ

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ – النساء : ١٧١

"আল্লাহ–ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত–পাক–পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" (আন নিসা, ১৭১)

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝ وَلَدَ اللَّهُ ۝ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।" (আস সাফ্ফাত, ১৫১–১৫২)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

"তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।"
(আস সাফফাত, ১৫৮)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ –

"লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অংশ বানিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।" (আয্ যুখরুফ, ১৫)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ – الانعام : ١٠٠ – ١٠١

"আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের স্রষ্টা। আর তারা না জেনে–বুঝে তাঁর জন্য পুত্র–কন্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।" (আল আনআম, ১০০–১০১)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ

"আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক–পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সন্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে।" (আল আম্বিয়া, ২৬)

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ-

"লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক-পবিত্র! তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?" (ইউনুস, ৬৮)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ -

"আর হে নবী! বলে দাও, সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অক্ষম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।" (বনী ইসরাঈল, ১১১)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ-

"আল্লাহ কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোন ইলাহও নেই।" (আল মু'মিনূন, ৯১)

যারা আল্লাহর জন্য ঔরসজাত সন্তান অথবা পালকপুত্র গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

৬. মূলে বলা হয়েছে কুফ্‌ (كفو) এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমতুল্য। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের দেশে কুফ্‌ শব্দের ব্যবহার আছে। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছেলের ও মেয়ের সমান পর্যায়ে অবস্থান করা। কাজেই এখানে এ আয়াতের মানে হচ্ছে ঃ সারা বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমমর্যাদা সম্পন্ন কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না।